অকর্তৃত্ব প্রভৃতি স্থাপনে। ঐ অংশেই সাংখ্য-শাস্ত্রের প্রামাণ্য, ঈশ্বরতত্ত্ব নিরাকরণে নহে।* বেদান্তের তাৎপর্য শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার স্থাপনে। এইরূপে তাৎপর্যাংশ বা মুখ্য উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া যেমন তিনি দর্শন-সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন, বিবেকানন্দও সেই প্রণালীতে ধর্মসমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। 'যো ধর্মঃ যত্র তাৎপর্য-বিশিষ্টঃ তত্রৈব তস্য প্রামাণ্যম্'—অর্থাৎ যে ধর্মের যে অংশে মুখ্য তাৎপর্য, যাহা তাহার প্রধান উদ্দেশ্য, সেই অংশেই তাহার (সেই ধর্মের) প্রামাণ্য; অপর অংশগুলি গৌণ-বিষয়ের বা লৌকিক ভ্রান্তমতের অনুবাদ মাত্র।

যে ধর্মের যে অংশে মুখ্য তাৎপর্য সেই অংশেই সেই ধর্মের প্রামাণ্য, অপর অংশগুলি ভ্রান্ত মতের অনুবাদমাত্র

বিবেকানন্দ বলিয়াছেন: 'আমি প্রত্যেক ধর্মের ভিতরকার প্রাণবস্তুর কথাই বলিতেছি। প্রত্যেক ধর্মের পশ্চাতে একটি করিয়া সারবস্তু বা "আত্মা" আছে; এবং এক ধর্মের আত্মা অন্য ধর্মের আত্মা হইতে পৃথক হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা কি একান্ত বিরোধী? তাহারা পরস্পরকে খণ্ডন করে, না একে অপরের পূর্ণতা সম্পাদন করে?—ইহাই প্রশ্ন। ...আমার সিদ্ধান্ত হয়তো আপনাদের কোন উপকারে আসিতে পারে, এই মনে করিয়া উহা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছি। আমার বিশ্বাস, তাহারা পরস্পরের বিরোধী নয়, পরস্পরের পরিপূরক। প্রত্যেক ধর্ম যেন মহান সার্বভৌম সত্যের এক একটি অংশ লইয়া তাহাকে বাস্তব রূপ প্রদান করিতে এবং আদর্শে পরিণত করিতে উহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতেছে। সুতরাং ইহা মিলনের ব্যাপার—বর্জনের নয়, ইহাই বুঝিতে হইবে।'[১৫]

প্রত্যেক ধর্মের সারবস্তু বা তাৎপর্য আছে

বিবেকানন্দের বিশ্বাস—ধর্মগুলি পরস্পরের পরিপূরক

এই মনোভাব হইতে সর্ব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগিবে এবং প্রয়োজন হইলে এক ধর্ম আর এক ধর্ম হইতেও সহায়তা লইয়া নিজস্ব পথে উন্নতি লাভ করিবে। শিকাগো মহাসম্মেলনের শেষ বক্তৃতায় বিবেকানন্দ এই মনোভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন: 'খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না; অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধকে খ্রীষ্টান হইতে হইবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া নিজ প্রকৃতি অনুসারে বর্ধিত হইবে।'[১৬]

---

* 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ'—অর্থাৎ প্রমাণের অভাববশতঃ ঈশ্বর (যেহেতু) সিদ্ধ হয় না—এই সাংখ্যসূত্রে ঈশ্বর-খণ্ডন রহিয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ইহা লোকসিদ্ধ নাস্তিকদের অনুবাদ মাত্র। উহাতে সাংখ্যের তাৎপর্য বা প্রয়োজন নাই।

১৫ বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৮১

১৬ ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৪



পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মই উচ্চ আধ্যাত্মিক পুরুষসকলের জন্ম দিয়াছে। ফলের স্বাদুতা দেখিয়া যেরূপ বৃক্ষের গুণ বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ ঐ সকল মহাপুরুষদের জীবনই প্রমাণ যে, যে যে ধর্মে তাঁহারা জীবনযাপন করিয়াছেন, তাহা সার্থক। সেই কারণে বিবেকানন্দ বলিতেছেন: 'সাধু চরিত্র, পবিত্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মমণ্ডলীর নিজস্ব সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্মপদ্ধতির মধ্যেই অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দেখেন যে, অন্যান্য ধর্ম লোপ পাইবে এবং তাঁহার ধর্মই টিকিয়া থাকিবে তবে তিনি বাস্তবিকই কৃপার পাত্র; তাঁহার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত, তাঁহাকে আমি স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছি, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির বাধা প্রদান সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লিখিত হইবে: "বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাব গ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।"[১৭]

এই প্রসঙ্গের—অর্থাৎ সর্বজনীন ধর্ম ও ধর্মসমন্বয়ের প্রসঙ্গের উপসংহারে বিবেকানন্দের ভাষায় বলা হইতেছে: 'নিজ মনোমধ্যে এই মানবস্বরূপ সাধারণ ভাবটি আছে বলিয়াই তদবলম্বনে আমি তোমাকে নর বা নারীরূপে জানিতে পারি। সর্বজনীন ধর্ম সম্বন্ধেও এই কথা। ইহা (ঐক্যের সূত্র) ঈশ্বরের ধারণা অবলম্বনে* পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসমূহে অনুস্যূত রহিয়াছে। ইহা অনন্তকাল ধরিয়া বর্তমান আছে এবং নিশ্চিতই থাকিবে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।" আমি মণিগণের ভিতর সূত্ররূপে বর্তমান রহিয়াছি—এই এক-একটি মণিকে এক-একটি ধর্মমত বা তদন্তর্গত সম্প্রদায় বিশেষ বলা যাইতে পারে। পৃথক পৃথক মণিগুলি এইরূপ এক-একটি ধর্মমত এবং প্রভুই সূত্ররূপে সেই-সকলের মধ্যে বর্তমান। তবে অধিকাংশ লোকই এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।'[১৮] 'ভগবান' বা 'ঈশ্বর'কে সূত্র বলিয়া অভিহিত করিয়া বিবেকানন্দ এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে ঐক্য বা সাধারণ (common) ভাব ধর্মসমূহের ঈশ্বরাভিমুখতা। যথার্থরূপে বুঝাইয়াই হউক, অথবা আংশিক বুঝাইয়াই হউক, সকল ধর্মই মানবজাতিকে ঈশ্বরের দিকে—পরম সত্যের দিকে অগ্রসর করাইয়া দিতেছে। ইহাই সকল ধর্মের সাধারণ ধর্ম।

সকল ধর্মে বিশ্বাতীত ঈশ্বরের ধারণা বিদ্যমান

ঈশ্বরাভিমুখতাই ধর্মসমূহের একটি সাধারণ ভাব

---

১৭ ঐ

* অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণাকে অবলম্বন করিয়া বা ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন ধর্মগুলি সূত্রে মণিগণের ন্যায় গ্রথিত রহিয়াছে।

১৮ বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৫৬

ভগবানের অনন্ত সত্যের সমস্ত জানিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া উদ্ধত স্পর্ধা করে। কতদূর প্রগলভতা একবার দেখুন।'[১৩]

জাতি সম্বন্ধে বিবেকানন্দের সুপরিচিত মত এই যে, প্রত্যেক জাতির একটা নিজস্ব উদ্দেশ্য থাকে, যেটি বিভিন্ন জাতিসমূহের সুশৃঙ্খল অবস্থিতির পক্ষে বিশেষ দরকার। যতদিন উক্ত জাতি সেই আদর্শকে ধরিয়া থাকে, ততদিন জাতির বিনাশ অসম্ভব। কিন্তু যদি ঐ জাতি উক্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত হয়, তাহা হইলে তাহার জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসে এবং জাতি অচিরেই বিনষ্ট হয়। বিবেকানন্দ বলিতেছেন: 'ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। এইসকল পুরাতন ধর্ম যে আজিও বাঁচিয়া রহিয়াছে, ইহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, এইগুলি নিশ্চয়ই সেই উদ্দেশ্য (আদর্শ) অটুট রাখিয়াছে। ধর্মগুলির সমুদয় ভুলভ্রান্তি, বাধাবিঘ্ন, বিবাদ-বিসংবাদ সত্ত্বেও, সেগুলির উপর নানাবিধ অনুষ্ঠান ও নির্দিষ্ট প্রণালীর আবর্জনা-স্তূপ (বাহ্য অংশ) সঞ্চিত হইলেও প্রত্যেকের প্রাণকেন্দ্র ঠিক আছে, উহা জীবন্ত হৃৎপিণ্ডের ন্যায় স্পন্দিত হইতেছে। ...ঐ ধর্মগুলির মধ্যে কোন ধর্মই, যে মহান উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছে, তাহা হারাইয়া ফেলে নাই। আর সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা চমকপ্রদ। দৃষ্টান্তস্বরূপ মুসলমানধর্মের কথাই ধরুন। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিগণ মুসলমানধর্মকে যত বেশী ঘৃণা করে, এরূপ আর কোন ধর্মকেই করে না। তাঁহারা মনে করেন, এরূপ নিকৃষ্ট ধর্ম আর কখনও হয় নাই। কিন্তু দেখুন, যখনই একজন লোক মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিল, অমনি সমগ্র ইসলামী সমাজ তাহাকে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে ভ্রাতা বলিয়া বক্ষে ধারণ করিল। এরূপ আর কোন ধর্ম করে না। এদেশীয় একজন রেড ইণ্ডিয়ান যদি মুসলমান হয়, তাহা হইলে তুরস্কের সুলতানও তাহার সহিত একত্র ভোজন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না এবং সে বুদ্ধিমান হইলে যে-কোন উচ্চপদ-লাভে বঞ্চিত হইবে না। ...ইসলাম ধর্ম তদন্তর্গত সকল ব্যক্তিকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকে। সুতরাং আপনারা দেখিতেছেন এইখানেই মুসলমানধর্মের নিজস্ব বিশেষ মহত্ত্ব। ...মুসলমানধর্ম জগতে যে বার্তা প্রচার করিতে আসিয়াছে, তাহা সকল মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কার্যে পরিণত এই ভ্রাতৃভাব, ইহাই মুসলমানধর্মের অত্যাবশ্যক সারাংশ, এবং স্বর্গ, জীবন প্রভৃতি অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধে যে-সমস্ত ধারণা, সেগুলি মুসলমানধর্মের সারাংশ নয়, অন্য ধর্ম হইতে উহাতে ঢুকিয়াছে।

বিবেকানন্দের অভিনব ধর্মসমন্বয় প্রচেষ্টা

প্রত্যেক ধর্মে একটি মুখ্য উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য বা আদর্শই ধর্মের মুখ্য সারাংশ, অন্য অংশ অবান্তর

স্বধর্মীর প্রতি অকুণ্ঠ ভ্রাতৃত্ব—ইহাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য, সুতরাং সার বা মুখ্যাংশ

১৩ তদেব, পৃঃ ১৭৪-৪৬



'হিন্দুদিগের মধ্যে একটি জাতীয় ভাব দেখিতে পাইবেন—তাহা আধ্যাত্মিকতা। অন্য কোন ধর্মে—পৃথিবীর অপর কোন ধর্মপুস্তকে ঈশ্বরের (পরমাত্মা বা পরতত্ত্বের) স্বরূপ নির্ণয় করিতে এত অধিক শক্তি-ক্ষয় (প্রয়োগ) করিয়াছে, ইহা দেখিতে পাইবেন না। তাঁহারা এভাবে আত্মার স্বরূপ নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যাহাতে কোন পার্থিব সংস্পর্শই ইহাকে কলুষিত করিতে না পারে। অধ্যাত্মতত্ত্ব ভগবৎ সত্তারই সমতুল, এবং আত্মাকে আত্মারূপে বুঝিতে হইলে উহাকে কখনও মানবত্বে পরিণত করা চলে না।...ত্যাগ এবং আধ্যাত্মিকতা —এই দুইটিই ভারতের (হিন্দুধর্মের) মহান আদর্শ এবং এ দুইটি ধরিয়া আছে বলিয়াই ভারতের এত ভুলভ্রান্তিতেও বিশেষ কিছু যায় আসে না।

হিন্দুদিগের প্রধান ভাব আধ্যাত্মিকতা

ত্যাগ ও আধ্যাত্মিকতা ধরিয়া আছে বলিয়া হিন্দুর মহাশক্তি

'খ্রীষ্টানদিগের প্রচারিত মূলভাবটিও এই: "অবহিত হইয়া প্রার্থনা কর, কারণ ভগবানের রাজ্য অতি নিকটে।"—অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি করিয়া প্রস্তুত হও। আর এই ভাব কখনও নষ্ট হইতে পারে না। ...খ্রীষ্টানগণ ঘোর অন্ধকার-যুগেও অতি কুসংস্কারগ্রস্ত খ্রীষ্টান দেশসমূহেও অপরকে সাহায্য করা, হাসপাতাল নির্মাণ করা প্রভৃতি সৎকার্যের দ্বারা সর্বদা নিজেদের পবিত্র করিবার চেষ্টা করিয়া প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। যতদিন পর্যন্ত তাঁহারা এই লক্ষ্যে স্থির থাকিবেন, ততদিন তাঁহাদের ধর্ম সজীব থাকিবে।'[১৪]

প্রার্থনা খ্রীষ্টধর্মের প্রধান ভাব, চিত্ত-শুদ্ধির জন্য পরোপকার সাধন

বিবেকানন্দের এইরূপে সকল ধর্মের তাৎপর্যাংশ বা মুখ্য উদ্দেশ্য গ্রহণ করিয়া অভিনব ধর্মসমন্বয় প্রচেষ্টা প্রাচীন একজন সাংখ্যাচার্যের দর্শন-সমন্বয়ের প্রচেষ্টাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সাংখ্যাচার্য বিজ্ঞান-ভিক্ষু ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-পাতঞ্জল এবং বেদান্তের সমন্বয় করিবার জন্য তাঁহার প্রসিদ্ধ সাংখ্য-প্রবচনভাষ্যের ভূমিকায় বলিয়াছেন: 'যৎ পরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ'—অর্থাৎ যে শাস্ত্রের যে অংশে মুখ্য তাৎপর্য সেই অংশই সেই শাস্ত্রের অর্থ। সুতরাং সেই অংশেই সেই শাস্ত্রের প্রামাণ্য। অপর অংশগুলি অবান্তর অনুবাদ মাত্র। এই ন্যায় (যুক্তি) প্রয়োগ করিয়া তিনি দর্শনসমূহের বিরোধ পরিহারের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ন্যায়-বৈশেষিকের তাৎপর্য দেহেন্দ্রিয়াদ্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্থাপনে। সুতরাং ঐ অংশেই ঐ শাস্ত্রের প্রামাণ্য, অপর অংশে (আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিতে) ঐ শাস্ত্রের তাৎপর্য নাই, সুতরাং প্রামাণ্যও নাই। সাংখ্য-পাতঞ্জলের তাৎপর্য আত্মার অসঙ্গত্ব,

১৪ তদেব, পৃঃ ১৮৭-৯০

যে বৈষম্য ও বিভিন্নতা অবশ্যই থাকিবে—ইহা বুঝিয়া অপর ধর্মাবলম্বীর প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা বা বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্মনিষ্ঠ থাকিতে হইবে। বলিতেছেন: 'প্রত্যেকেই তাহার নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে!...তোমার কর্তব্য, সুযোগ বিধান করা—বাধা দূর করা।...তোমার উন্নতি তোমার নিজের ভিতর হইতেই হইবে।'[১১] এই সকল কথাই ঈশ্বরভিত্তিক ও সাধন-ভিত্তিক সমন্বয়ের অর্থাৎ সহাবস্থানের এবং সমলক্ষ্যের কথা।

ভেদ বৈষম্য থাকিলেও বিদ্বেষ, ঘৃণা ত্যাগ করিয়া স্বধর্মনিষ্ঠ থাকিতে হইবে এবং অপরকে স্বধর্মনিষ্ঠ থাকিতে সাহায্য করিতে হইবে

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই ভাষণ বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যদেশে প্রদান করিয়াছিলেন—যে স্থানের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী অধিবাসীগণ সর্বদাই অন্য দেশের অন্য ধর্মাবলম্বীদের ( হিন্দুগণকে ) খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী করিয়া উদ্ধার করিতে ব্যাকুল। সুতরাং সকলের গ্রহণযোগ্য কোনও ধর্ম বা দর্শন হইতে পারে না, বৈষম্য থাকিবেই; শুধু বৈষম্যের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধান করিয়া বিদ্বেষ, ঘৃণা ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব ধর্মে নিষ্ঠাযুক্ত থাকিতে হইবে—ইহা তাহাদিগকে বুঝানোই ছিল বিবেকানন্দের উদ্দেশ্য। এই প্রকার ধর্মসমন্বয়ের ভাষণ ভারতে প্রয়োজন হয় নাই, কারণ, হিন্দুগণ কখনই অন্য ধর্মাবলম্বীদিগকে এক হিন্দুধর্মে আনিয়া শান্তি স্থাপন করিতে চাহে নাই।

আর একটি দৃষ্টিভঙ্গি হইতেও তিনি ধর্মসমন্বয়ের প্রচেষ্টা করিয়াছেন। তাহা হইল: সকল প্রধান প্রধান ধর্মগুলির অস্তিত্বের বা সহাবস্থানের একটি সার্থকতা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। বিবেকানন্দ বলিতেছেন: 'আমাদের সামাজিক জীবনসংগ্রাম যেমন বিভিন্ন জাতির বিবিধ প্রকার সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি মানবের আধ্যাত্মিক জীবনসংগ্রামও বিভিন্ন ধর্ম-অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেরূপ সর্বদাই পরস্পরের সহিত কলহ ও সংগ্রাম করিতেছে, সেইরূপ এই ধর্মসম্প্রদায়গুলিও সর্বদা পরস্পরের সহিত কলহ ও সংগ্রামে রত।... অতি প্রাচীনকাল হইতে কতকগুলি ধর্ম প্রচলিত আছে, যেগুলির মধ্যে এই ভাবটি ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান যে, সকল সম্প্রদায়ই বাঁচিয়া থাকুক; কারণ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কোন একটি নিজস্ব তাৎপর্য, কোন একটি মহান ভাব আছে, কাজেই উহা জগতের কল্যাণের জন্য আবশ্যক এবং উহাকে পোষণ করা উচিত। ...ধর্মান্ধ মতবাদ-অবলম্বনে আলোচনা ছাড়িয়া বিষয়টি সম্বন্ধে সাধারণ বিচারবুদ্ধি অবলম্বন করিলে প্রথমেই দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান প্রধান ধর্মে একটা প্রবল জীবনীশক্তি রহিয়াছে। কেহ কেহ হয়তো বলিবেন যে, তাঁহারা এ-বিষয়ে কিছু জানেন না, কিন্তু অজ্ঞতার কথা তুলিয়া নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। ...আপনাদের মধ্যে যাঁহারা

প্রধান প্রধান ধর্মে একটা বিশেষ প্রবল জীবনীশক্তি রহিয়াছে। উহা জগৎকল্যাণে আবশ্যক। তাই উহারা বাঁচিয়া আছে

১১ তদেব, পৃঃ ১৬০



সমগ্র জগতে অধ্যাত্মচিন্তার ( ধর্মচিন্তার ) গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ অবগত আছেন যে, পৃথিবীর একটিও মুখ্য ধর্ম মরে নাই; শুধু তাই নয়, এগুলির প্রত্যেকটিই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। খ্রীষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, হিন্দুরা বিস্তারলাভ করিতেছে এবং ইহুদীগণও সংখ্যায় অধিক হইতেছে। ...অতএব মনুষ্যজাতির বর্তমান ইতিহাসে ইহা একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা যে, পূর্বোক্ত সকল প্রধান প্রধান ধর্মই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং বিস্তার ও পুষ্টি লাভ করিতেছে। এই ঘটনার নিশ্চয়ই একটা অর্থ আছে, এবং সর্বজ্ঞ পরমকারুণিক সৃষ্টিকর্তার যদি ইহাই ইচ্ছা হইত যে, ইহাদের একটিমাত্র ধর্ম থাকুক এবং অবশিষ্ট সবগুলি বিনষ্ট হউক, তাহা হইলে উহা বহু পূর্বেই সংসাধিত হইত। ...সকল ধর্মই এক সময়ে উন্নতির দিকে, আবার অন্য সময়ে অবনতির দিকে যায়।'[১২] বিবেকানন্দ মনে করিয়াছেন, জগতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলির প্রত্যেকটিই পূর্ণ সত্যকে আংশিকভাবে প্রকাশ করিয়াছে মাত্র। ধর্মে ধর্মে বিবাদের কারণ কোন ধর্মে প্রকাশিত আংশিক সত্যকেই পূর্ণ ও একমাত্র সত্য বলিয়া ঘোষণা করিবার অপচেষ্টা। বিবেকানন্দ বলিতেছেন: 'ধর্মসম্প্রদায়বিশেষের এই দাবি যদি সত্য হইত যে, সমুদয় সত্য উহাতেই নিহিত এবং ঈশ্বর সেই নিখিল সত্য কোন গ্রন্থ-বিশেষে নিবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকেই দিয়াছেন—তবে জগতে এত সম্প্রদায় হইল কিরূপে? পঞ্চাশ বৎসর যাইতে না যাইতে একই পুস্তককে ( ধর্মগ্রন্থকে ) ভিত্তি করিয়া কুড়িটি নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। ঈশ্বর যদি কয়েকখানি পুস্তকেই ( ধর্মগ্রন্থে ) সমগ্র সত্য নিবদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঝগড়া করিবার জন্য তিনি কখনই আমাদিগকে সেগুলি দেন নাই, কিন্তু বস্তুতঃ দাঁড়াইতেছে তাই। ...প্রত্যেক সম্প্রদায় ঐ একই গ্রন্থ তাহার নিজের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছে যে, কেবল সেই উহা ঠিক ঠিক বুঝিয়াছে আর অপর সকলে ভ্রান্ত। প্রত্যেক ধর্ম সম্বন্ধেই এই কথা। ...আমি কোন সম্প্রদায়ের বিরোধী নই, বরং নানা সম্প্রদায় রহিয়াছে বলিয়া আমি খুশি। ...যতদিন পর্যন্ত মানুষ চিন্তা করিবে, ততদিন সম্প্রদায়ও থাকিবে। বৈষম্যই জীবনের চিহ্ন এবং বৈষম্য থাকিবেই। ...প্রকৃতপক্ষে তাহাদের ( ধর্মপ্রচারকদের ) আরও সুবিবেচক হওয়া আবশ্যক। ...অংশ নিজেকে পূর্ণ বলিয়া সর্বদা দাবি করা-রূপ, ক্ষুদ্র সসীম বস্তু নিজেকে অসীম বলিয়া সর্বদা জাহির করা-রূপ এত সঙ্কীর্ণতা জগতে কেন চলিয়া আসিতেছে, তাহার কারণ আমরা অতি সহজেই দেখিতে পাই। একবার সেইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলির কথা ভাবিয়া দেখুন, যেগুলি মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে ভ্রান্ত মানব-মস্তিষ্ক হইতে জাত হইয়াছে, অথচ

ধর্মপ্রচারকদিগের অবিবেচনাতেই কলহ, বিবাদ; অংশের নিজেকে পূর্ণ বলিয়া দাবি মূর্খতাপ্রসূত

১২ তদেব, পৃঃ ১৭৪-৭৭

জলপাষাণমৃৎকাষ্ঠবাস্ত্যাকুন্দালকাদয়ঃ।
ঈশ্বরাঃ সর্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ॥
যথা যথোপাসতে তং ফলমীয়ুস্তথা তথা।
ফলোৎকর্ষাপকর্ষৌ তু পূজ্যপূজানুসারতঃ॥[৪]

—অর্থাৎ ঈশ্বর, সূত্রাত্মা (হিরণ্যগর্ভ), বিরাট, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, বহ্নি প্রভৃতি এবং জল (গঙ্গা প্রভৃতি), পাষাণ, মৃৎ, কাষ্ঠ প্রভৃতি যাঁহারাই পূজিত হন তাঁহারা সকলেই ঈশ্বর; তবে পূজিত হইয়া পূজা এবং পূজা অনুসারে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট ফলদায়ক হইয়া থাকেন।

এইরূপে বিভিন্ন প্রকার উপাসনার উদ্দেশ্য ও ফল অবলম্বন করিয়া যে ঐক্য বা সমন্বয় অর্থাৎ সাদৃশ্য—তাহা অতি সুন্দর উপমার দ্বারা বুঝাইতে বিবেকানন্দ বলিয়াছেন: 'মনে করুন, আমরা সকলেই পাত্র লইয়া একটি জলাশয় হইতে জল আনিতে গেলাম। কাহারও হাতে বাটি, কাহারও কলসী, কাহারও বা বালতি ইত্যাদি, এবং আমরা নিজ নিজ পাত্রগুলি ভরিয়া লইলাম। তখন বিভিন্ন পাত্রের জল স্বভাবতই আমাদের নিজ নিজ পাত্রের আকার ধারণ করিবে।... কিন্তু প্রত্যেক পাত্রেই জল ব্যতীত অন্য কিছু নাই। ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। আমাদের মনগুলি এই পাত্রের মতো। (তাহা দ্বারা) আমরা প্রত্যেকেই ভগবান লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছি। ...ভগবান সেই জলস্বরূপ এবং প্রত্যেক পাত্রের পক্ষে ভগবদ্দর্শন সেই সেই আকারে হইয়া থাকে।'[৫] এই মনোজ্ঞ উপমার দ্বারা ইহাই বিবেকানন্দ বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, আমাদের 'মন'রূপ পাত্রের বিভিন্নতা ও বৈচিত্রহেতু মানুষের ঈশ্বরের ধারণা, উপাসনার প্রণালী, বা ধর্মীয় ধারণা বিভিন্ন প্রকারের হইলেও যেহেতু ঈশ্বর অদ্বিতীয় এবং সর্বত্রই এক, সকল ধর্ম ও উপাসনা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার দিকেই অগ্রসর হইতেছে। ছোট বড় সকল ঈশ্বর-ধারণা মানবকে ঊর্ধ্বগামী করিয়া থাকে।

জল এক অভিন্ন হইলেও আমাদের পাত্রের আকার অনুসারে বিভিন্ন আকার ধারণ করে; সেইরূপ ঈশ্বর এক হইলেও আমাদের মন ও ধারণাশক্তি অনুসারে ঈশ্বরের ধারণা ও দর্শন বিভিন্ন হয়

এস্থলে বিবেকানন্দ উল্লেখ না করিলেও এইটি শ্রীরামকৃষ্ণ উপদিষ্ট সমন্বয়েরই আরও সুস্পষ্ট যুক্তিযুক্ত রূপ। 'সর্ব ধর্মমতই সত্য—যত মত তত পথ।'[৬] মতে পথে

৪ পঞ্চদশী, ৬।২০৬, ২০৮-০৯

৫ বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৫৮-৫৯

৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, দ্বিতীয় ভাগ—স্বামী সারদানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৮৬, গুরুভাব—উত্তরার্ধ, পৃঃ ১৭৯



ধারণায় যদি কিছু ভেদ, কিছু ভুলত্রুটি থাকে, ঈশ্বর তো সর্বজ্ঞ, তিনি তো জানিবেন এই উপাসক আমাকেই ডাকিতেছে, আমাকেই চাহিতেছে। আন্তরিক ও ব্যাকুল হইলে তিনিই ভুল শুধরাইয়া দিবেন। ইহা ঈশ্বরভিত্তিক, উপাসনাভিত্তিক, ভক্তিভিত্তিক ধর্ম-সমন্বয়। ইহার আধুনিক প্রবক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ; তৎপূর্বে ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ[৭], তৎপূর্বেও ঋগ্বেদের মন্ত্র[৮]। পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্যও[৯] এই প্রকার ঈশ্বরভিত্তিক ও উপাসনাভিত্তিক সমন্বয়ের কথাই বলিয়াছেন।

ঈশ্বরভিত্তিক, উপাসনাভিত্তিক ও ভক্তিভিত্তিক ধর্মসমন্বয়

যদি এই অর্থেই বলা হয় সকল ধর্ম সত্য, অর্থাৎ সকল ধর্মই সেই ধর্মাবলম্বীদের ক্রমশঃ ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়, তবে আমাদের কার্যপ্রণালী, আমাদের মনোভাব কিরূপ হওয়া প্রয়োজন, সে-বিষয়ে বিবেকানন্দ বলিতেছেন: 'আমার কার্যপ্রণালী কি? মানবজাতিকে আমি প্রথমেই এই নীতিটি মানিয়া লইতে অনুরোধ করি—'কিছু নষ্ট করিও না', ধ্বংসবাদী সংস্কারকগণ জগতের কোন উপকারই করিতে পারে না।...যদি পারো সাহায্য কর; যদি না পারো, হাত গুটাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকো এবং যেমন চলিতেছে চলিতে দাও। যদি সাহায্য করিতে না পারো, অনিষ্ট করিও না। যতক্ষণ মানুষ অকপট থাকে, ততক্ষণ তাহার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিও না। দ্বিতীয়তঃ যে যেখানে রহিয়াছে, তাহাকে সেখান হইতে উপরে তুলিবার চেষ্টা কর।...আমরা প্রত্যেকেই যেন একটি বৃত্তের বিভিন্ন ব্যাসার্ধ দিয়া সেই কেন্দ্রেরই (ঈশ্বরের) দিকে অগ্রসর হইতেছি, তাহা হইলে আমরা সকলে নিশ্চয়ই কেন্দ্রে পৌঁছিব এবং যে-কেন্দ্রে সকল ব্যাসার্ধ মিলিত হয়, সেই কেন্দ্রে পৌঁছিয়া আমাদের সকল বৈষম্য তিরোহিত হইবে। কিন্তু যে পর্যন্ত না সেখানে পৌঁছাই, সে পর্যন্ত বৈষম্য অবশ্যই থাকিবে।'[১০] এই সকল উক্তির দ্বারা বিবেকানন্দ ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, সকল বিভিন্ন ধর্মই যে ব্যাসার্ধের ন্যায় কেন্দ্রের দিকে, পরম তত্ত্বের দিকে মানবগণকে অগ্রসর করাইতেছে এবং সেই কেন্দ্রে মিলিত হইবার পূর্বে

ধর্ম বা উপাসনা-রাজ্যে কিছু নষ্ট বা ধ্বংস করিবে না

চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার পূর্বে বৈষম্য অবশ্য থাকিবে; লক্ষ্যে পৌঁছিলে সকল ভেদ তিরোহিত হইবে

৭ যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪।১১

৮ 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬

৯ '...ঈশ্বরাঃ সর্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ...'—পঞ্চদশী, ৬।২০৬-২০৯

১০ বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৫৯-৬০

… সর্বজনীন দর্শন বলিয়া কিছু আছে কি? এখন পর্যন্ত তো কিছু হয় নাই। প্রত্যেক ধর্মই তাহার নিজ নিজ মতবাদ উপস্থিত করিয়া সেইগুলিকে একমাত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে জেদ করে। কেবলমাত্র ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। পরন্তু সেই-ধর্মাবলম্বী মনে করে, যে ঐ মতে বিশ্বাস না করে, পরলোকে তাহার গতি ভয়াবহ হইবে। কেহ কেহ আবার অপরকে স্বমতে আনিতে বাধ্য করিবার জন্য তরবারি পর্যন্ত গ্রহণ করে। ইহা যে তাহারা দুর্মতিবশতঃ করিয়া থাকে, তাহা নহে—গোঁড়ামি নামক মানব-মস্তিষ্ক-প্রসূত ব্যাধিবিশেষের তাড়নায় করিয়া থাকে। এই গোঁড়ারা খুব অকপট…কিন্তু তাহারা জগতের অন্যান্য পাগলদেরই মতো সম্পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞান-বর্জিত। অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধিরই মতো এই গোঁড়ামিও একটি ভয়ানক ব্যাধি। মানুষের যত রকম কুপ্রবৃত্তি আছে, এই গোঁড়ামি তাহাদের সবগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে। ইহা দ্বারা ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়, স্নায়ুমণ্ডলী অতিশয় চঞ্চল হয় এবং মানুষ ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র হইয়া উঠে।'[১]

আপাতদৃষ্টিতে ধর্মের সামঞ্জস্য দুঃসাধ্য ও সর্বজনীন দর্শন কিছু নাই বলিয়া মনে হয়

গোঁড়ামি নামক ব্যাধি সকল কলহ, সকল কু-বৃত্তির মূল

এ পর্যন্ত বিবেকানন্দের এই সকল বিশ্লেষণাত্মক উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সর্বজনীন ধর্মমত এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রত্যেকের মতবাদ বিলক্ষণ ও বিভিন্ন। প্রতিটি প্রধান ধর্মেই দার্শনিক, পৌরাণিক ও আনুষ্ঠানিক যে-তিনটি ভাগের কথা বিবেকানন্দ নিজেই বলিয়াছেন,[২] সেই তিনটি ক্ষেত্রেরও কোনটিতে এক ধর্মের সহিত আর এক ধর্মকে হুবহু মিলাইয়া ফেলা সম্ভব নহে। উপরন্তু অজ্ঞতা ও আসক্তি হইতে প্রসূত গোঁড়ামি নামক এক মারাত্মক ব্যাধি মানবকে ধর্মান্ধ করিয়া অপর ধর্মবিশ্বাসীকে পরকালে নরকস্থ করাইবার অথবা ইহকালেই ছিন্নমুণ্ড করাইবার প্রবৃত্তি দিয়া থাকে। তাহা হইলে উপায় কি? সর্বজনীন ধর্মের স্থাপনা কোন্ পথে হইতে পারে? বিবেকানন্দ বলিতেছেন: 'সর্বজনীন ধর্মের অর্থ যদি এই হয় যে, কতকগুলি বিশেষ মত জগতের সমস্ত লোকে বিশ্বাস করিবে, তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহা কখনও হইতে পারে না।… যখন এই জগৎ ধ্বংস হইবে, তখনই কেবল সাম্যরূপ ঐক্য আসিতে পারে; অন্যথা এরূপ হওয়া অসম্ভব।…এই পার্থক্য, এই বৈষম্য, আমাদের পরস্পরের মধ্যে এই সাম্যের অভাবই আমাদের উন্নতির প্রকৃত উৎস, উহাই আমাদের যাবতীয় চিন্তার প্রসূতি। চিরকাল এইরূপই চলিবে।…আমরা তবে কি করিতে পারি?—আমরা

১ বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৪৯-৫২

২ তদেব, পৃঃ ১৫১



ইহাকে সুচারুরূপে চলিতে সাহায্য করিতে পারি, ইহার ঘর্ষণ (বিরোধ, বিগ্রহ) কমাইতে পারি। ইহার চক্রগুলি তৈলসিক্ত ও মসৃণ রাখিতে পারি। কিরূপে?—বৈষম্যের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া। আমাদিগকে আমাদের স্বভাববশতই যেমন একত্ব স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ বৈষম্যও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে যে, একই সত্য লক্ষ ভাবে প্রকাশিত হইতে পারে, এবং প্রত্যেক ভাবটিই তাহাদের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে যথার্থ। আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে, কোন বিষয়কে শত প্রকার বিভিন্ন দিক হইতে দেখা চলে, অথচ বস্তুটি একই থাকে। সূর্যের কথা ধরা যাক। মনে করুন, এক ব্যক্তি…একটি ক্যামেরা লইয়া সূর্যের অভিমুখে যাত্রা করিয়া যে পর্যন্ত না সূর্যে পৌঁছায়, সেই পর্যন্ত পুনঃপুনঃ সূর্যের প্রতিচ্ছবি লইতে লাগিল।…যখন সে ফিরিয়া আসিবে, তখন মনে হইবে, বাস্তবিক সে যেন কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সূর্যের প্রতিকৃতি লইয়া আসিয়াছে। ভগবান সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট দর্শনের মধ্য দিয়াই হউক, সূক্ষ্মতম অথবা স্থূলতম পৌরাণিক আখ্যায়িকার ভিতর দিয়াই হউক, সুসংস্কৃত ক্রিয়াকাণ্ড অথবা জঘন্য ভূতোপাসনাদির মধ্য দিয়াই হউক, প্রত্যেক সম্প্রদায়—প্রত্যেক ব্যক্তি—প্রত্যেক জাতি—প্রত্যেক ধর্ম জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ঊর্ধ্বগামী হইয়া ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবারই চেষ্টা করিতেছে। মানুষ সত্যের যত প্রকার অনুভূতি লাভ করুক না কেন, তাহার প্রত্যেকটি ভগবানেরই দর্শন ছাড়া অপর কিছুই নয়।'[৩] বিবেকানন্দের ধর্মসমন্বয় বিষয়ক এই সকল উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ধর্মসমন্বয় সুবোধ্য বা সুসাধ্য নহে। ধর্মসমূহের স্থূল, সূক্ষ্ম ও মূলে—অর্থাৎ ক্রিয়াকাণ্ড, পৌরাণিক অংশ ও দার্শনিক তত্ত্বেও ঐক্য বা সমন্বয় লাভ কঠিন। আরও গভীরে যাইয়া উপাসনা এবং উপাসনার উদ্দেশ্য ও ফলকে ধরিয়া একপ্রকার সমন্বয় বা ঐক্য লাভ করা যাইতে পারে। অপরোক্ষ উপলব্ধির ভূমিতেই ঐক্যস্থাপন সম্ভব। বিবেকানন্দের কথিত এই সমন্বয়প্রচেষ্টা পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্যকথিত সমন্বয়ের বাণী স্মরণ করাইয়া দেয়। বিদ্যারণ্য বলিয়াছেন:

ঈশ-সূত্র-বিরাট্‌বেধোবিষ্ণুরুদ্রেন্দ্র বহ্নয়ঃ।
বিঘ্নভৈরবমৈরালমারিকাযক্ষরাক্ষসাঃ॥

বৈষম্যের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকারের দ্বারা বিরোধ প্রশমিত হইতে পারে

একই সত্য বহুভাবে প্রকাশিত হইতে পারে ইহা স্বীকার করিতে হইবে

সকল ধর্মই মানুষকে ঊর্ধ্বগামী করিবার—ঈশ্বরাভিমুখী করিবার চেষ্টা করে

৩ তদেব, পৃঃ ১৫৪-৫৮

কিন্তু শেষের অংশ সেই তত্ত্বেরই অনুসিদ্ধান্ত হইলেও ইহা মহাপ্রাণ বিবেকানন্দের নিজস্ব মনোভাব—নিজস্ব হৃদয়াবেগ।

বিবেকানন্দের মানবতাবাদের ভিত্তি বা উৎস তাঁহারই রচিত একটি কবিতার শেষে অতি স্পষ্টরূপেই প্রকাশিত হইয়াছে :

ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।[১৪]

এই উক্তি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, জীবরূপী ঈশ্বরের সেবাই, শিবজ্ঞানে জীবসেবাই বিবেকানন্দের মানবতাবাদের ভিত্তি।

হিউম্যানিজমের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব বা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের 'ভ্রাতৃত্ব' যে বিবেকানন্দের মানবতাবাদের ভিত্তি নহে, তাহা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে যখন তিনি বলিতেছেন :

পাশ্চাত্ত্যের ভ্রাতৃত্বের বাণী জার্মানিশদের উক্তি—ব্রহ্মতত্ত্বই মানবতার প্রকৃত উৎস

'আত্মার অনন্ত একত্বই সর্বপ্রকার নীতির মূল ভিত্তি; তোমাতে আমাতে শুধু "ভাই ভাই" সম্বন্ধ নহে—মানবের দাসত্বশৃঙ্খল মোচন-চেষ্টার বর্ণনাপূর্ণ সকল গ্রন্থেই এই "ভাই ভাই"-ভাবের কথা আছে এবং শিশুতুল্য ব্যক্তিরাই তোমাদের নিকট উহা প্রচার করিয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি আমি এক—ভারতীয় দর্শনের ইহাই সিদ্ধান্ত। সর্বপ্রকার নীতি ও ধর্মবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি এই একত্ব।'[১৫]

সুতরাং বেদান্তের অদ্বৈতবাদ 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ', শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা' এবং ব্যাস ও মনুর দানের অর্থাৎ সেবার শ্রেষ্ঠতাকীর্তন—এইগুলিই বিবেকানন্দের মানবতাবাদের উৎস বা ভিত্তি।

১৪ তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৬১

১৫ তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৭৮

॥ ৯ ॥

## বিবেকানন্দের সর্বজনীন ধর্ম ও ধর্মসমন্বয় প্রচেষ্টা

মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং বিদ্বেষ স্থূলতম ক্ষেত্র হইতে সূক্ষ্মতম ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। এই রাগ ও দ্বেষের—এই দুই শক্তির কার্যক্ষেত্র যতই সূক্ষ্মতর বা উচ্চতর হয়, ইহাদের প্রভাব ততই স্পষ্ট ও তীব্র হইয়া থাকে। বিবেকানন্দ বলিতেছেন : 'ধর্মই মানবের চিন্তা ও জীবনের সর্বোচ্চ স্তর; এবং আমরা দেখিতে পাই, ধর্মজগতেই এই শক্তিদ্বয়ের ক্রিয়া সর্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়াছে। মানুষ যত প্রকার প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছে, তন্মধ্যে তীব্রতম প্রেমলাভ হইয়াছে ধর্ম হইতে এবং মানুষ যত প্রকার পৈশাচিক ঘৃণার পরিচয় পাইয়াছে, তাহারও উদ্ভব হইয়াছে ধর্ম হইতে (ধর্মের নামে)। জগৎ কোন কালে যে মহত্তম শান্তিবাণী শ্রবণ করিয়াছে, তাহা ধর্মরাজ্যের লোকদেরই মুখনিঃসৃত, এবং জগৎ কোন কালে যে তীব্রতম নিন্দা ও অভিশাপ শ্রবণ করিয়াছে, তাহাও ধর্মরাজ্যের লোকেদের মুখেই উচ্চারিত হইয়াছে। কোন ধর্মের উদ্দেশ্য যত উচ্চতর এবং উহার কার্যপ্রণালী যত সুবিন্যস্ত, তাহার ক্রিয়াশীলতা ততই আশ্চর্য।* ধর্মপ্রেরণায় মানুষ জগতে যে রক্তবন্যা প্রবাহিত করিয়াছে, মনুষ্যহৃদয়ের অপর কোন প্রেরণায় তাহা ঘটে নাই, আবার ধর্মপ্রেরণায় যত চিকিৎসালয় ও আতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অন্য কিছুতেই তত হয় নাই। ধর্মপ্রেরণার ন্যায় মনুষ্যহৃদয়ের অপর কোন বৃত্তি তাহাকে শুধু মানবজাতির জন্য নয়, নিম্নতম প্রাণি-গণের জন্য পর্যন্ত এতটা যত্ন লইতে প্রবৃত্ত করে নাই।···ধর্মরাজ্যের এই প্রবল বিবাদ-বিসংবাদের স্তরে একটি অবিচ্ছিন্ন সমন্বয় বিরাজিত থাকা কি কখনও সম্ভব? বর্তমান শতাব্দীর শেষভাগে এই মিলনের প্রশ্ন লইয়া জগতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সমাজে এই সমস্যা পূরণের নানারূপ প্রস্তাব উঠিতেছে এবং সেগুলি কার্যে পরিণত করিবার নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছে; কিন্তু ইহা যে কতদূর কঠিন, তাহা আমরা সকলেই জানি।···মানুষের মধ্যে যে প্রবল স্নায়বিক উত্তেজনা রহিয়াছে, তাহা মন্দীভূত করা—মানুষ একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া মনে করে।··· আমরা সকলেই বাল্যকাল হইতে প্রেম, শান্তি, মৈত্রী, সাম্য, সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি অনেক কথাই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু সেগুলি আমাদের কাছে কতকগুলি নিরর্থক শব্দমাত্রে পরিণত হইয়াছে।··· বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা বাস্তবিক কঠিন ব্যাপার।

* এই সকল ভাষণ পাশ্চাত্যদেশে প্রদত্ত। সুতরাং তাহারা 'ধর্ম' বলিতে যেরূপ দলীয় ধর্ম বা চার্চ ধর্ম বুঝে সে অর্থেই এই শব্দ ব্যবহৃত।

কিন্তু শেষের অংশ সেই তত্ত্বেরই অনুসিদ্ধান্ত হইলেও ইহা মহাপ্রাণ বিবেকানন্দের নিজস্ব মনোভাব—নিজস্ব হৃদয়াবেগ।

বিবেকানন্দের মানবতাবাদের ভিত্তি বা উৎস তাঁহারই রচিত একটি কবিতার শেষে অতি স্পষ্টরূপেই প্রকাশিত হইয়াছে :

ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।[১৪]

এই উক্তি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, জীবরূপী ঈশ্বরের সেবাই, শিবজ্ঞানে জীবসেবাই বিবেকানন্দের মানবতাবাদের ভিত্তি।

হিউম্যানিজমের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব বা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের 'ভ্রাতৃত্ব' যে বিবেকানন্দের মানবতাবাদের ভিত্তি নহে, তাহা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে যখন তিনি বলিতেছেন :

পাশ্চাত্যের ভ্রাতৃত্বের বাণী জ্ঞানিশ্রেষ্ঠের উক্তি—ব্রহ্মাত্মতত্ত্বই মানবতার প্রকৃত উৎস

'আত্মার অনন্ত একত্বই সর্বপ্রকার নীতির মূল ভিত্তি; তোমাতে আমাতে শুধু "ভাই ভাই" সম্বন্ধ নহে—মানবের দাসত্বশৃঙ্খল মোচন-চেষ্টার বর্ণনাপূর্ণ সকল গ্রন্থেই এই "ভাই ভাই"-ভাবের কথা আছে এবং শিশুতুল্য ব্যক্তিরাই তোমাদের নিকট উহা প্রচার করিয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি আমি এক—ভারতীয় দর্শনের ইহাই সিদ্ধান্ত। সর্বপ্রকার নীতি ও ধর্মবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি এই একত্ব।'[১৫]

সুতরাং বেদান্তের অদ্বৈতবাদ 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ', শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা' এবং ব্যাস ও মনুর দানের অর্থাৎ সেবার শ্রেষ্ঠতাকীর্তন—এইগুলিই বিবেকানন্দের মানবতাবাদের উৎস বা ভিত্তি।

১৪ ঐ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৬১
১৫ ঐ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৭৮

॥ ৯ ॥

## বিবেকানন্দের সর্বজনীন ধর্ম ও ধর্মসমন্বয় প্রচেষ্টা

মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং বিদ্বেষ স্থূলতম ক্ষেত্র হইতে সূক্ষ্মতম ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। এই রাগ ও দ্বেষের—এই দুই শক্তির কার্যক্ষেত্র যতই সূক্ষ্মতর বা উচ্চতর হয়, ইহাদের প্রভাব ততই স্পষ্ট ও তীব্র হইয়া থাকে। বিবেকানন্দ বলিতেছেন : 'ধর্মই মানবের চিন্তা ও জীবনের সর্বোচ্চ স্তর; এবং আমরা দেখিতে পাই, ধর্মজগতেই এই শক্তিদ্বয়ের ক্রিয়া সর্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়াছে। মানুষ যত প্রকার প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছে, তন্মধ্যে তীব্রতম প্রেমলাভ হইয়াছে ধর্ম হইতে এবং মানুষ যত প্রকার পৈশাচিক ঘৃণার পরিচয় পাইয়াছে, তাহারও উদ্ভব হইয়াছে ধর্ম হইতে (ধর্মের নামে)। জগৎ কোন কালে যে মহত্তম শান্তিবাণী শ্রবণ করিয়াছে, তাহা ধর্মরাজ্যের লোকদেরই মুখনিঃসৃত, এবং জগৎ কোন কালে যে তীব্রতম নিন্দা ও অভিশাপ শ্রবণ করিয়াছে, তাহাও ধর্মরাজ্যের লোকেদের মুখেই উচ্চারিত হইয়াছে। কোন ধর্মের উদ্দেশ্য যত উচ্চতর এবং উহার কার্যপ্রণালী যত সুবিন্যস্ত, তাহার ক্রিয়াশীলতা ততই আশ্চর্য।* ধর্মপ্রেরণায় মানুষ জগতে যে রক্তবন্যা প্রবাহিত করিয়াছে, মনুষ্যহৃদয়ের অপর কোন প্রেরণায় তাহা ঘটে নাই, আবার ধর্মপ্রেরণায় যত চিকিৎসালয় ও আতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অন্য কিছুতেই তত হয় নাই। ধর্মপ্রেরণার ন্যায় মনুষ্যহৃদয়ের অপর কোন বৃত্তি তাহাকে শুধু মানবজাতির জন্য নয়, নিম্নতম প্রাণিগণের জন্য পর্যন্ত এতটা যত্ন লইতে প্রবৃত্ত করে নাই।...ধর্মরাজ্যের এই প্রবল বিবাদ-বিসংবাদের স্তরে একটি অবিচ্ছিন্ন সমন্বয় বিরাজিত থাকা কি কখনও সম্ভব? বর্তমান শতাব্দীর শেষভাগে এই মিলনের প্রশ্ন লইয়া জগতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সমাজে এই সমস্যা পূরণের নানারূপ প্রস্তাব উঠিতেছে এবং সেগুলি কার্যে পরিণত করিবার নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছে; কিন্তু ইহা যে কতদূর কঠিন, তাহা আমরা সকলেই জানি।...মানুষের মধ্যে যে প্রবল স্নায়বিক উত্তেজনা রহিয়াছে, তাহা মন্দীভূত করা—মানুষ একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া মনে করে।...আমরা সকলেই বাল্যকাল হইতে প্রেম, শান্তি, মৈত্রী, সাম্য, সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি অনেক কথাই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু সেগুলি আমাদের কাছে কতকগুলি নিরর্থক শব্দমাত্রে পরিণত হইয়াছে।... বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা বাস্তবিক কঠিন ব্যাপার।

* এই সকল ভাষণ পাশ্চাত্যদেশে প্রদত্ত। সুতরাং তাহারা 'ধর্ম' বলিতে যেরূপ দলীয় ধর্ম বা চার্চ ধর্ম বুঝে সে অর্থেই এই শব্দ ব্যবহৃত।

একটি সর্বজনীন ধর্মের স্বপ্ন বা কল্পনা বিবেকানন্দের মনে উদিত হওয়াতে তিনি বলিতেছেন : 'আমি এমন একটি ধর্ম প্রচার করিতে চাই, যাহা সকল প্রকার মনের উপযোগী হইবে—ইহা সমভাবে দর্শনমূলক, তুল্যরূপে ভক্তিপ্রবণ, সমভাবে "মরমী" ( mystic ) এবং কর্মপ্রেরণাময় হইবে। ...এই প্রকার সমন্বয়ই সার্বভৌম ধর্মের নিকটতম আদর্শ হইবে। ভগবানের ইচ্ছায় যদি সকল লোকের মনেই এই জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের প্রত্যেকটি ভাবই পূর্ণমাত্রায় অথচ সমভাবে বিদ্যমান থাকিত, তবে কি সুন্দরই না হইত! ইহাই আদর্শ, ইহাই আমার পূর্ণ মানবের আদর্শ। যাহাদের চরিত্রে এই ভাবগুলির একটি বা দুইটি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে একদেশী বলি এবং সমস্ত জগৎই সেইরূপ একদেশদর্শী মানুষে পরিপূর্ণ এবং তাহারা কেবল সেই রাস্তাটিই জানে, যাহাতে নিজেরা চলাফেরা করে ; এতদ্ব্যতীত অপর যাহা কিছু সমস্তই তাহাদের নিকট বিপজ্জনক ও জঘন্য। এই চারিটি দিকে সামঞ্জস্যের সহিত বিকাশ লাভ করাই আমার প্রস্তাবিত ধর্মের আদর্শ এবং ভারতবর্ষে আমরা যাহাকে "যোগ" বলি, তাহা দ্বারাই এই আদর্শ ধর্ম লাভ করা যায়। কর্মীর দৃষ্টিতে ইহার অর্থ, ব্যষ্টির সহিত সমগ্র মানবজাতির অভেদ-ভাব ; "মরমী"র ( রাজযোগীর ) দৃষ্টিতে ইহার অর্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব সাধন ; ভক্তের নিকট ইহার ( যোগের ) অর্থ নিজের সহিত প্রেমময় ভগবানের মিলন এবং জ্ঞানীর নিকট ইহার অর্থ নিখিল সত্তার ঐক্যবোধ। "যোগ" শব্দে ইহাই বুঝায়। ইহা একটি সংস্কৃত শব্দ এবং সংস্কৃতে এই চারিপ্রকার যোগের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যিনি এই প্রকার যোগসাধন করিতে চান তিনিই "যোগী"। ...অতএব "যোগী" বলিতে ইঁহাদের ( কর্মযোগী, ভক্তিযোগী, রাজযোগী, জ্ঞানযোগী ) সকলকেই বুঝায়।'[১৯]

বিবেকানন্দের সর্বজনীন ধর্মের কল্পনা ও আশা

অধিকাংশ মানুষই একদেশী অর্থাৎ একপেশে ভাবযুক্ত

কর্মযোগীর যোগ সকল মানবের হিতার্থে কর্ম

চারিপ্রকার মানসিকতা অনুসারে চারিপ্রকার যোগী

এই সর্বপ্রকার যোগ একটি ব্যক্তির জীবনে অভ্যস্ত ও আয়ত্ত হইতে খুব কমই দেখা যায় ; কিন্তু বিবেকানন্দ এই প্রকার পূর্ণযোগই সকল মানবের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন—যাহা আমরা গীতার উপদেশে এবং গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণের জীবনে দেখিতে পাই। বিবেকানন্দ এই প্রসঙ্গে চারিপ্রকার যোগের আলোচনা করিয়া পূর্ণযোগের পথ প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু ঐ স্থলে গীতার নাম উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার গীতা-চিন্তায় এই যোগ-সমন্বয়ের বা পূর্ণযোগের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

যে সর্বজনীন ধর্মের ইঙ্গিত তিনি পাশ্চাত্যের বক্তৃতায় করিয়াছেন তাহা বস্তুতঃ গীতারই যোগ-সমন্বয়

১৯ তদেব, পৃঃ ১৬৫-৬৪



ধর্মসমন্বয়ের প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের নিম্নোক্ত উক্তিগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিতেছেন : 'দল বাঁধিয়া কখন ধর্ম ( অধ্যাত্মসাধনা ) হইতে পারে না। ধর্মের প্রকৃত সাধনা প্রত্যেকের নিজের নিজের কাজ। আমার নিজের একটা ভাব আছে—পরম পবিত্র জ্ঞানে উহা আমাকে গোপন রাখিতে হইবে ; কারণ আমি জানি, ওটি আপনার ভাব না হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সকলকে আমার ভাব বলিয়া বেড়াইয়া তাহাদের অশান্তি উৎপাদন করিব কেন? তাহারা আসিয়া আমার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে।...এই ইষ্ট প্রত্যেকেরই গোপন রাখা উচিত ; উহা আপনি জানিবেন ও আপনার ভগবান জানিবেন। ধর্মের তাত্ত্বিক ভাব বা মতবাদগুলি সর্বসাধারণের নিকট প্রচার করা যাইতে পারে, সমবেত মণ্ডলীর নিকট প্রকাশ করা যাইতে পারে, কিন্তু উচ্চতর ধর্ম অর্থাৎ সাধন-রহস্য সর্বসাধারণের নিকট প্রচার করা যাইতে পারে না।...ইহাই ইষ্টনিষ্ঠা। প্রত্যেককে যদি নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী ধর্ম সাধন করিতে হয়, যদি অপরের সহিত বিবাদ এড়াইতে হয় এবং যদি আধ্যাত্মিক জীবনে যথার্থ উন্নতি-লাভ করিতে হয়, তবে এই ইষ্টনিষ্ঠাই তাহার একমাত্র উপায়।'[২০] এই সকল উক্তিতে বিবেকানন্দ ইহাই ইঙ্গিত করিতেছেন, ধর্মসমন্বয়ের যে প্রধান উদ্দেশ্য—নির্বিরোধ, অবিবাদ ও নিজ নিজ সাধনায় শান্তভাবে অগ্রগতি—একমাত্র নিজ নিজ ইষ্টনিষ্ঠার দ্বারাই তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে। কারণ, নিজস্ব ধর্ম ও ইষ্টের প্রতি তাহার প্রীতির অনুভব হইতে সে অন্যের ইষ্টনিষ্ঠা ও ধর্মপ্রীতির মর্যাদা বুঝিতে পারিবে। কাজেই, অন্যের ইষ্ট বা ধর্মকে নিন্দা করিতে সে কুণ্ঠিত হইবে।

প্রকৃত ধর্মানুষ্ঠান দল বাঁধিয়া হয় না

নিজের ভাব বা ইষ্ট গোপন রাখাই কর্তব্য

'গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ'

সর্বপ্রকার সমন্বয়ের উদ্দেশ্য নির্বিরোধে ইষ্টনিষ্ঠা

ইষ্টনিষ্ঠাই উন্নতির শ্রেষ্ঠ উপায়

বস্তুতঃপক্ষে প্রাচীন কালের শ্রীকৃষ্ণের জীবনে এবং তাঁহার গীতোপদিষ্ট যোগসমন্বয়ে আমরা বিবেকানন্দের অভিলষিত সর্বজনীন ধর্ম প্রাপ্ত হই। আর বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ও বাণীতে উক্ত সর্বপ্রকার যোগের সমন্বয় প্রাপ্ত হই। মধ্যবর্তী কালে আচার্য শঙ্করের জীবনী ও বাণীতে আমরা জ্ঞান, রাজযোগ, ভক্তি ও কর্মের সমাবেশ ও অবিরোধ দেখিতে পাই। তাঁহার ভাষ্যসমূহ জ্ঞান পক্ষপাতী বা অদ্বৈত পক্ষপাতী হইলেও, তাঁহার প্রকরণগ্রন্থসমূহ এবং অপূর্ব দেব-স্তোত্রসমূহ তাঁহার ভক্তি ও সমন্বয়ভাবের প্রকাশক। সমগ্র ভারত ভ্রমণপূর্বক তাঁহার বৈদিক ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা, তীর্থস্থান সমূহের উদ্ধার, মন্দির স্থাপন প্রভৃতি

একদেশী নহে, এরূপ সর্বাঙ্গীণ ধর্ম আমরা পাই শ্রীকৃষ্ণের গীতায় এবং বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার উপদেশে

২০ তদেব, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৫৫-৫৬